কিশোর শরৎ সমগ্র

সম্পাদনা
সুনীল জানা

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শরৎ-কথা

'ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি,

এর আগে তোমাদের জন্য কখনো লিখিনি। যাঁরা তোমাদের প্রিয় লেখক, তাঁদের মুখে শুনি—তোমাদের খুশি করা বড় শক্ত। অথচ সম্পাদকরা অনুরোধ করেছেন কয়েকটি গল্প লিখে দিতে। এ যেন কুমোরের কাছে কুড়ুল গড়ার ফরমাশ। এই বিপদে হঠাৎ মনে পড়লো এক বাল্যবন্ধুর কথা। ভাবলাম আজ তারই দু'-একটা গল্প বলি। শুনে খুশি হও ভালই।'

ছোটদের জন্য লেখা 'ছেলেবেলার গল্প' বইটির ছোট্ট ভূমিকা হিসেবে এ কথাগুলি লিখেছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শুধু ছোটদের কথা ভেবে তিনি বেশি না লিখলেও তাঁর বিপুল রচনাবলীর মধ্যে ছোটদের মনের খোরাকের কোন অভাব নেই। তাঁর বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার থেকে বেছে বেছে তেমনি কিছু অবিস্মরণীয় রচনা এখানে একত্রে সংকলিত হল, যেগুলি ছোটদের কাছে তাদের জন্যেই লেখা বলে মনে হবে এবং ভবিষ্যতে শরৎ-সাহিত্য পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করবে তাদের মনে।

শরৎচন্দ্রের কালজয়ী রচনাবলী শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও পরম সম্পদ। ছোট ছোট বাঙালি ছেলেমেয়েরা তাদের বয়সোপযোগী রূপকথা উপকথা এ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদির রঙিন রাজ্য পেরিয়ে সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রধানত শরৎ-সাহিত্যের হাত ধরেই। সে কথা মনে রেখেই এই কিশোর-সংকলনটির পরিকল্পনা।

তাঁর লেখার মতই ভারি আশ্চর্য ও আকর্ষণীয় এই ছন্নছাড়া ভবঘুরে মানুষটির জীবন। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর নামে একটি ছোট্ট গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে। বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মা ভুবনমোহিনী দেবী। ছোটবেলায় গ্রামের পাঠশালা ও স্কুলেই তাঁর পড়াশুনার সুরু। সাংসারিক অভাব অনটনের জন্য পরে তিনি চলে যান বিহারের ভাগলপুরে তাঁর মাতামহের বাড়িতে এবং সেখানেই পড়াশুনা করতে থাকেন। তাঁর ছেলেবেলার বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে এই ভাগলপুরে। এখানেই তিনি বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার বা রাজুকে, যিনি কখনো ইন্দ্রনাথ বা কখনো লালু নামে অতি পরিচিত হয়ে আছেন তাঁর রচনায়। আর তাদের মতই ছোটবেলায় তিনি ছিলেন পাকা সাঁতারু, ছিপ ফেলে মাছ ধরতে এবং পাখি শিকার করতে ওস্তাদ। এমনকি সাপুড়েদের মত অনায়াসেই বিষধর সাপ ধরতে পারতেন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই শরৎচন্দ্র ছিলেন যেমন মেধাবী, তেমনি দুরন্ত স্বভাবের। এই দুরন্তপনাই তাঁকে এমন করে ভবঘুরে করে তুলেছিল। তাছাড়া এ স্বভাব কিছুটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকেই এবং সেইসঙ্গে সাহিত্য-প্রতিভাও। নিজের কথা নিজেই তিনি বলেছেন—

'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এককথায়

সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি।.....অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি।'

কলেজে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র টাকার অভাবে পাঠ্যবই কিনতে পারেন নি। এফ. এ. পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে না পারায় তাঁর আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। শেষপর্যন্ত তিনি একটা চাকরি নিয়ে রেঙ্গুনে চলে যান। যাবার আগে বন্ধুদের অনুরোধে 'কাশীনাথ' নামে একটা গল্প লিখে 'কুন্তলীন' প্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে ছিলেন। সেই গল্পই শ্রেষ্ঠ গল্প রূপে বিবেচিত হয়। সেই থেকেই তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে জয়যাত্রার সূচনা। তাঁর নিজের কথায়— 'বাঙ্গালা দেশে বোধহয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক, যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।'

১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তাঁর বিচিত্র কর্মজীবন কেটেছে রেঙ্গুনে। এখানে থাকার সময়েই তিনি বিয়ে করেন শান্তি দেবীকে। কিন্তু কিছুকাল পরে দুরারোগ্য প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তিদেবী ও শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়। তার অনেকদিন পরে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তাঁর এই স্ত্রী হিরন্ময়ীদেবী ছিলেন নিঃসন্তান।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বাজে শিবপুরে ভাড়া বাড়িতে বাস করতে থাকেন। এখানে প্রায় ৯ বছর ছিলেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ স্মরণীয় রচনাই এখানে থাকাকালীন রচিত। পরে তিনি হাওড়া জেলার সামতাবেড় গ্রামে রূপনারায়ণ নদের তীরে একটি সুন্দর মাটির বাড়ি তৈরি করে সেখানে চলে আসেন। আরো পরে কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি দোতলা সুন্দর পাকা বাড়ি তৈরি করেন। কখনো সামতাবেড়, কখনো কলকাতা—এই ভাবেই শেষজীবন কাটিয়েছেন তিনি।

বাজে শিবপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' সাহিত্যসভায়। পরে নানা সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

শরৎচন্দ্র শুধু একজন অসামান্য জনপ্রিয় লেখকই ছিলেন না, ছিলেন গায়ক, বাদক, অভিনেতা—এমনকি একজন চিকিৎসকও। দরিদ্র লোকদের অসুখে বিনি পয়সায় চিকিৎসা করা ছাড়াও তাদের পথ্য পর্যন্ত কিনে দিতেন। এই অসাধারণ হৃদয়বান মানুষটির দরদ শুধু মানুষের উপরই নয়, জীবজন্তুদের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। আর ছিলেন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল। বেশভূষায় কিছুটা সৌখীন। যেমন জমিয়ে গল্প করতে ও আড্ডা দিতে পারতেন, তেমনি ছিলেন পরিহাস রসিক। নামে তো শরৎচন্দ্র, তাই বোধহয় শরতের চাঁদের আলোর মতই তাঁর মনটাও ছিল স্বচ্ছ নির্মল আর কোমল। আর তেমনি ছিল তাঁর লেখাও। আজও তিনি সাহিত্যের জনপ্রিয়তম লেখক। তাঁর নতুন বই প্রকাশের দিন প্রকাশকের দোকানে আগে থেকে বিরাট লম্বা লাইন পড়ত বই কেনার জন্য। আজও যেন কল্পনা করা যায় না তেমন দৃশ্যের কথা!

শেষজীবনে শরৎচন্দ্র যকৃত ও পাকস্থলীতে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। অনেক চিকিৎসা ও শেষ পর্যন্ত অপারেশান করা সত্ত্বেও তাঁকে সুস্থ করা সম্ভব হয় নি। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি, বাংলা ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ রবিবার ৬১ বছর বয়সে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা দেশবাসীর সঙ্গে গভীর শোকাভিভূত রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন—

'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।'

সূচিপত্র

রামের সুমতি □ ৯

বিন্দুর ছেলে □ ৩৩

মেজদিদি □ ৬৫

শ্রীকান্ত □ ৮৩

বাল্য স্মৃতি □ ১২৩

ছেলেবেলার গল্প □ ১২৯

দেওঘরের স্মৃতি □ ১৪৭

মহেশ □ ১৫১

অভাগীর স্বর্গ □ ১৬১

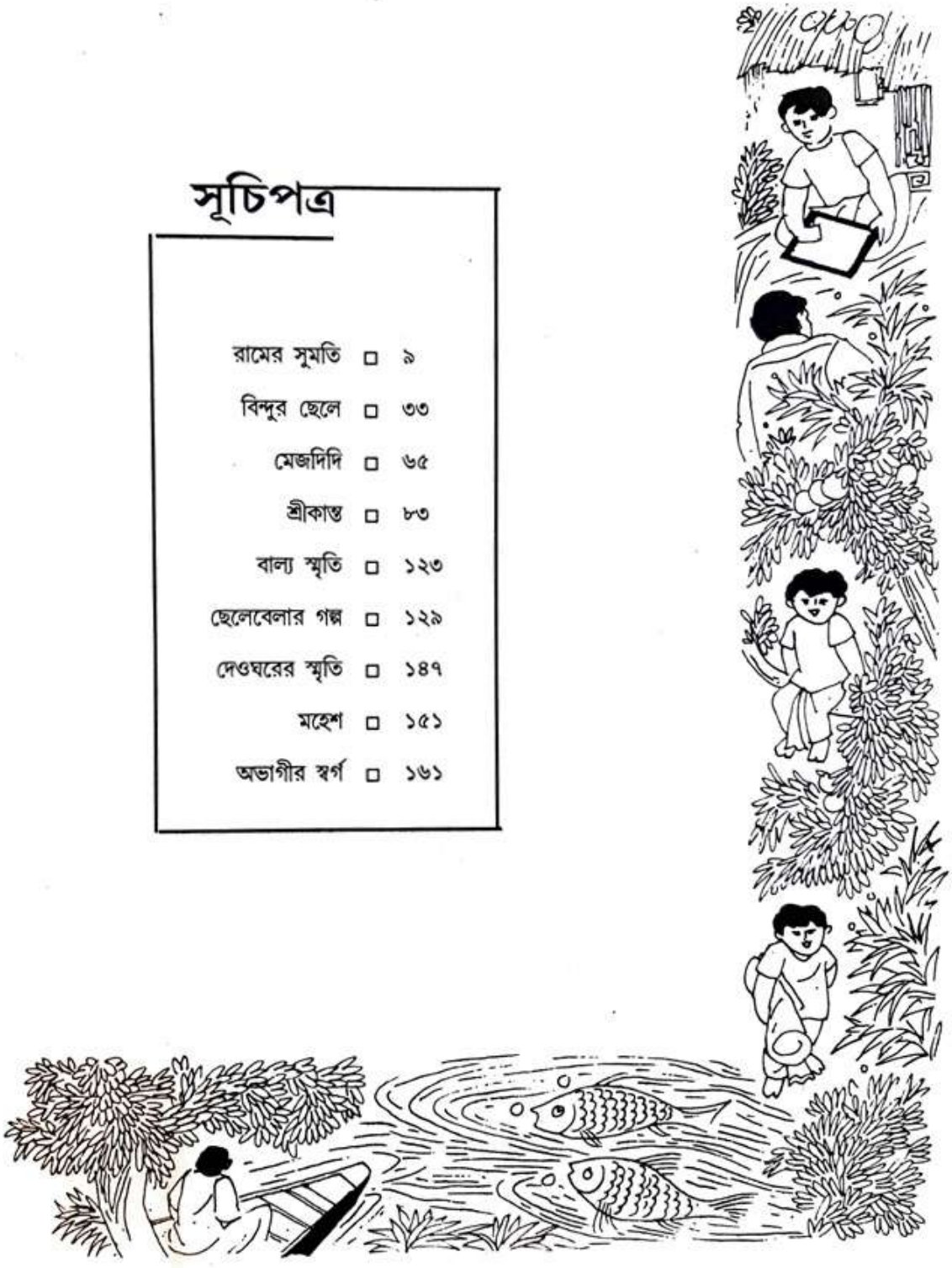

রামের সুমতি

এক

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন্ দিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারিতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু-দশ ঘর বাগ্‌দী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন,—সে আজ তের বছরের কথা—সেই বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বৎসরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তেরো বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের একটাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া অ্যারারুট ও ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীর দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আসতে পারবে না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব। টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আন্ গে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, কেন তুমি অত ব্যস্ত হচ্চ? ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষেতি হবে?

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারা তলায় বসিয়া পাখির খাঁচা তৈরি করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক্ নেত্য, আমি যাচ্ছি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্ আমার, যাস্‌নে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, ঝগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাত করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়া ছিল, কহিল, খাঁচা বুনবে না কাকা?

বুনবো অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ, কি কাণ্ড বা করে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুনল না, আমার মানা শুনবে?

হাত ধরলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার একদণ্ডও যদি বাঁচতে ইচ্ছা করে! ও নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—ভোলাকে পাঠিয়ে দি গে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয়ত এখনো গরু নিয়ে মাঠে যায়নি।

নেত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেনসারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিক্তিহাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচজন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ দিচ্ছি—

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভালো হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন, নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙ্গা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো! তবে নিতে আসিস কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে আর ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলো স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বার বলিল,—তুমি ছোট জাত, বামুনের মান-মর্যাদা জান না, তাই বলে ফেললে,—পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সদ্যই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আম-বাগান করেচ, বেশী বড় হয়নি ত,—ও কুড়ুলের এক-এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে এই শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিলেন, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকানো-টুকানো যা আছে, তাই নিয়ে যাও। ও রামঠাকুর—যা বলে গেছে তা ফলাবে, তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিলেন, আমি থানায় দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার তকুইনাইন খেয়ে কান ভোঁভোঁ করতেছে—রামঠাকুর কি যে বলে গেল, তা শুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখতে ছোট, কিন্তু

ওনার বাগ্‌দী ছোকরার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোক দেখতে আসবে, না দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার করবে! ও-সব আমরা পারব না—ওনাকে সবাই ডরায়। তার চেয়ে যা বলে গেছে, তাই কর গে। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি—আজ দুখানা রুটি-টুটি খাব নাকি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, সাক্ষী দিবিনে তোরা? তবে দূর হ' এখান থেকে। আমি কারুর হাত দেখতে পারব না—মরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেখি, তোদের কি গতি হয়।

বৃদ্ধ লাঠিটি হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল—দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় শয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েও যেতে হবে, না হলে, হয়ত বা মনে করবে, থানায় যাবার মতলব আমরাই দিয়েছি। বিঘেটাক বেগুন-চারা লাগিয়েছি—বেশ ডাগর হয়েও উঠেছে—হয়ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপড়ে রেখে যাবে। বাগদী ছোঁড়াগুলো ত রাত্তিরে ঘুমোয় না। বাবু থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওনারে ঠাণ্ডা করে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেলেন,—দুনিয়ার কোন শালার ভাল করতে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছটফট করিতেছিলেন। রাম বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—গোবিন্দ, খাঁচা ধরবি আয়।

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, একবার এদিকে আয়।

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক দিয়া বলিলেন, আয় বলচি শিগগির।

রাম কাঠিগুলা নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তপোশের একধারে পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হল?

হাঁ।

কি বললি তাঁকে?

আসতে বললুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—শুধু আসতে বললি—আর কিছু বলিস্‌ নি?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল্‌ না, কি বলেছিস তাঁকে?

বলব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তারবাবু আসচেন।

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া, পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না-সারা কি ডাক্তারের হাতে? তোমার দেওরটি ত আমাকে দু'টি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভালো, না সারে ত আমার ঘর-দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ-রকম কথা, আপনি কোন ভয় করবেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটা দল আছে। তাদের যে-কথা, সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয়, মা! আমরা ওষুধই দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।

নারায়ণী চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্যামলাল রুষ্ট হইয়া বলিলেন, ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে, তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্বনাশ! আমার ভিজিট ত এক টাকা। তার বেশী আমি কোনমতেই নিতে পারব না—ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দু'দিনের, কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের।

দুই দিন পূর্বে এইখানেই যে এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হউক, নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং সংসার আবার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

দুই

মাস-দুই পরে একদিন তিনি নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণকলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায়?

বাঁদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নেত্য বলিল, ছোটবাবু এই ত ছিল—ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরি কচ্চে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের এক মাচা শশাগাছ কেটে দিয়ে এসেছিস কেন?

তারা আমাকে কাটতে দেখেছে?

তারা দেখেনি, আমি দেখেছি। কেন কেটেছিস বল্?

আমাকে বুড়ী মাগী অপমান করলে কেন?

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরি কচ্ছিলি কেন, তাই আগে বল্?

রামলাল রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চুরি কচ্ছিলুম? কখ্খন না! এতটুকু একটা শশা নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ বাঁদর! একশ' বার হয়। বুড়ো-ধাড়ী, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটা জানে। দাঁড়িয়ে থাক্ এক-পায়ে, পাজী, দাঁড়া বলচি।

এ বাড়িতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘন্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মত এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়া ছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট করিয়া বলিল, কাকা, দাঁড়াও এক-পায়ে—এমনি করে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রণালীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কষাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক-পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনই করিয়া এক-পায়ে দাঁড়াইয়া, কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা, হয়েছে। আর এমন করিস নে।

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনিভাবে এক-পায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে গেলেন, সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে ঝাড়া দিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিল; তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই সে পূর্বের মত সবেগে ঝাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে বাহিরে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইস্কুলের সময় হয়নি ছোটবাবু? মা ডাকচেন।

রাম জবাব দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই, এইভাবেই বসিয়া রহিল।

নৃত্য সামনে আসিয়া বলিল, মা চান করে খেয়ে নিতে বলচেন।

রাম চোখ রাঙ্গাইয়া গর্জিয়া উঠিল, তুই দূর হ।

কিন্তু মা কি বলেচেন শুনতে পেয়েচ?

না, পাইনি। আমি নাব না, খাব না—কিছু করব না—তুই যা।

আমি গিয়ে বলচি তাঁকে, বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—ওরে ও ভূত! ও কি করলি? ও ডোবাটায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না, তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি?

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আনিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার মনের ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, এ-বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ্ এখনো আমার রান্না শেষ হয়নি—লক্ষ্মীটি খাও!

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, তোমার জন্যই ওর সব-রকম বদ অভ্যাস হচ্চে মা! অত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি! একটু রাগ করলেই খাইয়ে দিতে হবে—ও আবার কি কথা!

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, না হলে খায় না যে। রাত্তিরের লোভ না দেখালে ও ঐখানে একবেলা ঘাড় গুঁজে বসে থাকতো—খেত না।

নৃত্যকালী বলিল, না, খেত না! ক্ষিদে পেলে আপনি খেত। অত বড় ছেলে—

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোরা ওর বয়সই দেখিস! বড় হলে, বুদ্ধি হলে ওর আপনিই লজ্জা হবে। তখন কি আর কোলে বসতে চাইবে, না, খাইয়ে দিতে বলবে?

নৃত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, ভালর জন্যই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি ? ষোল-সতর বছর বয়সে যদি ওর জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়, তবে হবে কবে?

নারায়ণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। কারো বা দু'বছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক ভাল, না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?

নেত্য বলিল, ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি-রকম দুষ্টু হয়ে উঠেচে তা ত নিজেও দেখতে পাচ্চ। পাড়ার লোকে বলে, তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী রুক্ষস্বরে বলিলেন, পাড়ার লোকে আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না। কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স, সমস্ত সকালবেলাটা যে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে, না কি হবে, তার পরে কি বলিস উপোস করিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না, নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

এই কথা লইয়া কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা নেত্য জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলিনি। লোকে বলে, তাই একটু সাবধান করে দেওয়া।